গবেষণা প্রতিবেদন



বজ্রপাত নিয়ন্ত্রণ ঃ বাংলাদেশ প্রেক্ষিত

বজ্রপাত নিয়ন্ত্রণ ঃ বাংলাদেশ প্রেক্ষিত

খান ফাউন্ডেশন

জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের সহিত বিশেষ পরামর্শক মর্যাদাপ্রাপ্ত

বজ্রপাত নিয়ন্ত্রণ : বাংলাদেশ প্রেক্ষিত

এডভোকেট রোখসানা খন্দকার
মোঃ মোর্শেদ আলম

কম্পিউটার ডিজাইন
মোঃ দিদার-উল হক রানা

স্বত্বাধিকারী
আবদুল মোমেন খান মেমোরিয়াল ফাউন্ডেশন (খান ফাউন্ডেশন)

প্রকাশকাল ঃ নভেম্বর ২০২০

সকল স্বত্ত্ব প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত। প্রকাশকের পূর্বানুমতি ব্যতীত এর কোনরূপ মুদ্রণ, এমনকি পুনঃমূদ্রণ অথবা কোন প্রকার পরিবর্তন, পরিবর্ধন, পরিমার্জন করা যাবে না। কোন ব্যক্তি যদি এর সাথে সংশ্লিষ্ট মুদ্রণজনিত কোন বেআইনী কাজে জড়িত থাকেন তা দণ্ডণীয় ও ফৌজদারী অপরাধ হিসেবে বিবেচিত হবে।

Knowledge shall make us Free

আবদুল মোমেন খান মেমোরিয়াল ফাউন্ডেশন
মোমেনবাগ ঢাকা ১২১৭ বাংলাদেশ ফোন ঃ ৯৩৩ ০৩২৩ ফ্যাক্স ঃ ৯৩৩ ১৫৮৯
e-mail: khanfoundation@hotmail.com, info@khan-foundation.org
Website: www.khan-foundation.org

সূচীপত্র

বজ্রপাত আবহাওয়া সম্পর্কিত দ্বিতীয় বৃহত্তম ঘাতক

বাংলাদেশের জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব

বজ্রপাত কী ও কেন?

বাংলাদেশে বজ্রপাতে মৃত্যু বাড়ছে কেন?

বাংলাদেশে বজ্রপাতে মৃত্যু বাড়ছে কেন?

বজ্রপাতে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচার কৌশল

বজ্রপাত প্রতিরোধ ও বাংলাদেশের প্রস্তুতি

বজ্রপাত প্রতিরোধে গৃহীত উদ্যোগ

১. বজ্রপাত আবহাওয়া সম্পর্কিত দ্বিতীয় বৃহত্তম ঘাতক

বজ্রপাতে মৃত্যুর সংখ্যা দুনিয়ার বুকে বাংলাদেশেই বেশি। সম্প্রতি সারাদেশে এই দুর্যোগে বিপর্যস্ত হচ্ছে জনজীবন। দুর্যোগের বলয়ে বন্দি বাংলাদেশের বুকে এই বজ্রদুর্যোগ দীর্ঘ করছে মৃত্যুর মিছিল। গত সাত বছরে বজ্রপাতে বাংলাদেশে মারা গেছে সাড়ে তিন হাজারেরও বেশি মানুষ। বাংলাদেশে বছরে গড়ে ৮০ থেকে ১২০ দিন বজ্রপাত হচ্ছে বলে গবেষণায় প্রকাশ। বজ্রপাতের কারণে একদিকে যেমন পরিবেশ দূষিত হচ্ছে, তেমনি পরিবেশ দূষণের কারণেও বজ্রপাতের হার বেড়ে গেছে। হঠাৎ এই বজ্রপাত বৃদ্ধি এবং এতে মৃত্যুর সংখ্যা বাড়ছে কেন? আবহাওয়াবিদদের কাছে বজ্রপাতের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা থাকলেও নেই কোনো প্রস্তুতি। এ ব্যাপারে বাংলাদেশের মাথাব্যথা না থাকলেও বজ্রপাত গবেষণায় বিশ্ব থেমে নেই।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞরা বলেছেন, বজ্রপাতের পেছনে বায়ুদূষণ অন্যতম কারণ। বজ্রপাতকে আবহাওয়া সম্পর্কিত দ্বিতীয় বৃহত্তম ঘাতক হিসেবে চিহ্নিত করেছেন কেউ কেউ। বাংলাদেশে বছরের দুটি মৌসুমে বজ্রপাত বেশি হয়। জনসংখ্যার ঘনত্ব বেশি হওয়ায় বাংলাদেশে বজ্রপাতে মৃত্যুর সংখ্যাও বাড়ছে। আবহাওয়া অধিদফতরের সাপ্তাহিক ও দীর্ঘমেয়াদি পূর্বাভাস তালিকায় নতুন যুক্ত হয়েছে বজ্রঝড়।

যুক্তরাষ্ট্রের কেন্ট স্টেট ইউনিভার্সিটির ডিপার্টমেন্ট অব জিওগ্রাফির অধ্যাপক ড. টমাস ডবি- উ স্মিডলিনের 'রিস্ক ফ্যাক্টরস অ্যান্ড সোশ্যাল ভালনারেবেলিটি' শীর্ষক গবেষণা থেকে দেখা যায়, প্রতি বছর মার্চ থেকে মে পর্যন্ত সময়ে বাংলাদেশে প্রতি বর্গকিলোমিটার এলাকায় ৪০টি বজ্রপাত হয়। গবেষণায় তিনি বলেন, বজ্রপাতে বছরে মাত্র দেড়শ'র মতো লোকের মৃত্যুর খবর বাংলাদেশের পত্রিকায় ছাপা হলেও আসলে এ সংখ্যা ৫০০ থেকে এক হাজার। গবেষণায় টমাস দেখান যে, ঝড় ও বজ্রঝড়ে বিশ্বে সবচেয়ে বেশি মানুষের মৃত্যু ঘটছে বাংলাদেশে।

বজ্রপাতের ভয়াবহতা ও প্রতিকারের উপায় নিয়ে সার্কভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে গবেষণার জন্য ঢাকায় প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে সার্ক মিটিওরোলজিক্যাল রিসার্চ সেন্টার (এসএমআরসি)। এসএমআরসির গবেষণা কর্মকর্তা আবদুল মান্নান বলেন, 'বজ্রপাতের হার ও মৃত্যুর সংখ্যা দুটোই উদ্বেগজনক হারে বাড়ছে। ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, নেপাল, ভুটান ও বাংলাদেশের বজ্রপাতের প্রবণতা নিয়ে সার্ক স্টর্ম প্রজেক্ট নামে আমাদের গবেষণা চলছে।' তিনি বলেন, বাংলাদেশ বজ্রপাত-ঝুঁকিপূর্ণ দেশ।

বাংলাদেশে বজ্রপাতের ওপর তেমন কোনো গবেষণা না হলেও ইউরোপ, জাপান ও আমেরিকায় চলছে বিস্তর গবেষণা। ২০০৮ সালে সুইডেনের উপসালায় অনুষ্ঠিত ২৯তম 'ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স অন লাইটিং প্রটেকশন' শীর্ষক সম্মেলনে তেল আবিব বিশ্ববিদ্যালয়ের জিওফিজিক্স বিভাগের গবেষক কলিন প্রাইস তার 'থান্ডারস্টর্ম, লাইটিং অ্যান্ড ক্লাইমেট চেঞ্জ' শীর্ষক গবেষণাপত্রে দেখান, বায়ুদূষণ তথা পরিবেশ দূষণের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে বজ্রপাতের। এ নিবন্ধে বলা হয়, বজ্রপাতে একদিকে যেমন বায়ুদূষণের মাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে, তেমনি বায়ুদূষণের ফলে বেড়েছে পরিবেশে বজ্রপাতের হার ও এর তীব্রতা।

ন্যাশনাল সেন্টার ফর অ্যাটমস্টেফরিক রিসার্চের্র (এনসিএআর) বিজ্ঞানী ডেভিড এডওয়ার্ডস গবেষণায় খুঁজে পান, বায়ুমতা বাড়ছে। ইউরোপের কয়েকটি শহরে এ গবেষণা করা হয়। ২০০৪ সালে ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক নিউজ বজ্রপাতকে আবহাওয়া সম্পর্কিত দ্বিতীয় বৃহত্তম ঘাতক হিসেবে চিহ্নিত করে।

বিশ্বখ্যাত সায়েন্স ডেইলিতে প্রকাশিত 'গ্লোবাল ওয়ার্মিং লাইকলি টু ইনক্রিস স্টর্মি ওয়েদার, স্পেশালি ইন সার্টেন ইউএস লোকেশন' শীর্ষক পারডু বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক দলের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ভবিষ্যতে আবহাওয়া অনুকূল হবে, না তীব্র ঝড়বৃষ্টির মধ্যে প্রতিকূল হবে, তা বজ্রপাতের ধরনের ওপর নির্ভর করে।

২. বাংলাদেশের জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব

বাংলাদেশে কয়েক বছর ধরে বৃষ্টিপাতের হার ও তাপমাত্রা বেড়ে গেছে। এই সময়ে সেখানে তাপমাত্রা এতটাই বেড়ে গেছে যে মানুষের জীবন হয়ে উঠেছে দুর্বিষহ। ঝড়, তাপ ও শৈত্যপ্রবাহ, বজ্রপাত ও সুনামির মতো দুর্যোগ ঘন ঘন বাংলাদেশের ওপর হানা দিচ্ছে। বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপের হার আগের চেয়ে বেড়েছে। বেশ কয়েক বছর আগে নিম্নচাপ হলে ১ বা ২ নম্বর সতর্ক সংকেত বেশি দেখানো হতো। এখন তা দেখানো হচ্ছে সরাসরি ৩ নম্বর সতর্ক সংকেত থেকে। আবহাওয়া অধিদফতর থেকে প্রায়ই সমুদ্রে লঘু বা নিম্নচাপ ছাড়াই বায়ুচাপের তারতম্যের মাত্রা বেড়ে গেছে বলে জানানো হচ্ছে। হঠাৎ ঝড়ো হাওয়ায় প্রায়ই বঙ্গোপসাগর থেকে জেলেদের নিখোঁজ হওয়ার সংবাদ গণমাধ্যমগুলোতে আসছে। কুতুববদিয়া, ভোলা, কক্সবাজারসহ বেশ কয়েকটি উপকূলীয় জেলায় সমুদ্রের প্রবল ঢেউয়ের কারণে ভাঙন তৈরি হচ্ছে। বেসরকারী সংস্থা অক্সফামের এক রির্পোটে বলা হয়েছে, ২০০৭-২০০৮ সালের বন্যায় দেশের নতুন নতুন এলাকায় বন্যার পানি প্রবেশ করেছে। বাঁধ ও এমব্যাংকমেন্টসহ বন্যা প্রতিরোধে তৈরি করা বিভিন্ন স্থাপনা পানির ঢল ঠেকাতে পারেনি। ফলে কৃষকের অর্ধেক বছরের খোরাকি ও বেঁচে থাকার অবলম্বন আমন ধানের উৎপাদন চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ঝড়, তাপ ও শৈত্যপ্রবাহ, বজ্রপাত ও সুনামির মতো দুর্যোগ ঘন ঘন বাংলাদেশের ওপর হানা দিচ্ছে। বন্যা মোকাবেলার জন্য তৈরি করা অবকাঠামোগুলোর সীমাবদ্ধতার পাশাপাশি জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবকেও দায়ী করছেন বিশেষজ্ঞরা। হিমালয়ের বরফ গলে নদীগুলোতে পানিপ্রবাহ বেড়ে যাওয়ায় বন্যায় ক্ষয়ক্ষতি বেশি হয়েছে বলে ধারণা করছেন তারা।

ক. সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ও শৈত্যপ্রবাহ

বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণে প্রায় প্রতিবছরই সর্বনিম্ন তাপমাত্রা অনুভূত হতো সিলেট ও শ্রীমঙ্গলে। ১০ বছর ধরে রাজশাহী ও খুলনা বিভাগে শীতকালে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা অনুভূত হচ্ছে। সেই সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে শৈত্যপ্রবাহ বেড়ে গেছে তাপমাত্রাও। তাপপ্রবাহের বেড়ে যাবার কারণে দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে নগর ও গ্রামের জীবন। ২০০৭-০৮ সালে দেশে শৈত্যপ্রবাহের কারণে মারা গেছে শতাধিক মানুষ। মৃতদের বেশিরভাগই নারী ও শিশু। সবচেয়ে বেশি মারা গেছে উত্তরবঙ্গের দারিদ্র্যপীড়িত জেলাগুলোতে। সরকারি-বেসরকারি সংস্থাগুলো শীতার্ত মানুষের সাহায্যে এগিয়ে এলেও তা ভোগান্তি খুব সামান্যই কমাতে পেরেছে। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা নেমে যাওয়ার পাশাপাশি শীতকালে শৈত্যপ্রবাহ এবং ঘনকুয়াশার স্থায়ীত্ব ও তীব্রতা বাড়ছে। আবহাওয়া অধিদফতরের দেওয়া হিসাব অনুযায়ী বাংলাদেশে প্রতি বছর ০.০০৩৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস করে তাপমাত্রা বাড়ছে। ১০ বছর আগেও বেশিরভাগ সময় দেশের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা অনুভূত হতো রাজশাহী বিভাগের বিভিন্ন জেলায়। কিন্তু কয়েক বছর ধরে এই পরিস্থিতি পাল্টে গেছে। দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের জেলাগুলোতে প্রায়ই তাপমাত্রা ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত উঠছে। জলবায়ু বিশেষজ্ঞরা ধারণা করছেন, সমুদ্রপৃষ্ঠের তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়ার কারণেই দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে তাপমাত্রা বাড়ছে। এ প্রবণতা সামনের দিনে আরো বাড়বে বলে বিশেজ্ঞদের আশঙ্কা।

খ. নিম্নচাপের হার বাড়ছে

গত ৪ বছর বঙ্গোপসাগর তীরবর্তী অঞ্চলে নিম্নচাপ ও লঘুচাপ বৃদ্ধির প্রবণতা বাড়ছে। ফলে সমুদ্রবন্দরগুলোকে মে থেকে অক্টোবর পর্যন্ত প্রায় প্রতি মাসেই একাধিকবার ৩ নম্বর বিপদ সংকেত দেখিয়ে যেতে বলা হয়। অনেক ক্ষেত্রে নিম্ন বা লঘুচাপ ছাড়াও সমুদ্রে বায়ুচাপের তারতম্যের কারণে ঝড়ো হাওয়া বয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় বিপদ সংকেত দেখিয়ে যেতে বলা হয়েছে। প্রায়ই সাগর হয়ে উঠছে উত্তাল।

গ. অসময়ের তাপদাহ

সাধারণত বাংলাদেশে অক্টোবরের শুরু থেকে মাঝামাঝি যখন হালকা হিমেল হাওয়া বয়ে যাওয়ার কথা, কিন্তু গত বছরের হিসাবে দেখা যাচ্ছে তখন বাংলাদেশের ওপর দিয়ে বয়ে গেছে গ্রীষ্মের প্রচন্ড তাপদাহ। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত চলেছে গরমের তীব্রতা। গরমের তীব্রতায় অনেকে জ্বর, সর্দি, কাশিসহ নানা ধরনের ভাইরাসজনিত রোগে আক্রান্ত হয়েছেন। শরতের এ সময়টাতে সাধারণত দেশের স্বাভাবিক তাপমাত্রা ৩০ থেকে ৩২ ডিগ্রির মধ্যে ওঠানামা করে। অক্টোবরের মাঝামাঝি গিয়ে তাপমাত্রা আরো কমে ৩০ ডিগ্রির নিচে চলে যায়। অথচ এ সময় তাপমাত্রা ৩৫ থেকে ৩৬ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে ওঠানামা করেছে। এ সময় দেশের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা যশোরে ৩৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস আর রাজধানী ঢাকায় ছিল ৩৫ দশমিক ৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহে দেশের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা পাওয়া গেছে ময়মনসিংহে ৩৬ দশমিক ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

ঘ. জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বাড়ছে

দেশের উপকূলীয় এলাকার ওপর জরিপ চালিয়ে দেশি-বিদেশি সংস্থাগুলো বলছে, দেশের উপকূলীয় এলাকায় জোয়ারের উচ্চতা বেড়েছে বলে স্থানীয়রা জানিয়েছে। বেশ কয়েকটি এলাকায় প্রতিবছর ভয়াবহ মাত্রায় সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বেড়ে যাওয়ায় জোয়ারের পানি বাঁধ ও বোল্ডার পর্যন্ত ভেঙে ফেলছে। ফলে প্লাবিত হয়ে পড়ছে বিপুলসংখ্যক কৃষিজমি ও বসতি। সরকারি হিসাব অনুযায়ী গত ১০০ বছরে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা ০.৫ মিটার বৃদ্ধি পেয়েছে। সমুদ্র ভাঙনের কবলে পড়ে কুতুবদিয়ার ২৫০ ও সন্দ্বীপের ১৮০ বর্গকিলোমিটার এলাকা সমুদ্রগর্ভে বিলীন হয়ে গেছে।

ঙ. বজ্রপাত

নদী শুকিয়ে যাওয়া, জলাভূমি ভরাট হওয়া আর গাছ ধ্বংস হওয়ায় দেশে তাপমাত্রা এক থেকে দেড় ডিগ্রি সেলসিয়াস বেড়ে গেছে। বর্ষা মৌসুম শেষ দিকে হলেও তাপমাত্রা বেশি হারে বাড়ছে। এতে এই সময়ে বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বেড়ে যাচ্ছে। আর দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর থেকে ভেসে আসা আর্দ্র বায়ু আর উত্তরে হিমালয় থেকে আসা শুষ্ক বায়ুর মিলনে বজ্রঝড় হচ্ছে। বাংলাদেশে প্রতিবছর বর্ষার আগে মার্চ থেকে মে মাসে কালবৈশাখীর সঙ্গে বজ্রপাতের ঘটনা ঘটে।

৩. বজ্রপাত কী ও কেন :

মহাভারতের দেবরাজ ইন্দ্রের অব্যর্থ অস্ত্রের নাম ছিল 'বজ্র'। অসুরদের পরাস্ত করতে দধীচি মুনির বুকের অস্থিতে বানানো হয়েছিল এই অস্ত্র। সেসব পুরাণের কথা। জলবায়ু পরিবর্তন আর দুর্যোগের এই যুগে বজ্রের সংজ্ঞা 'ঝড়বৃষ্টির সময় আকাশে বিদ্যুতের ঝলকানির সঙ্গে সৃষ্ট প্রচন্ড শব্দ'। প্রশ্ন ওঠে কীভাবে হয় এই বজ্রপাত?

প্রাকৃতিকভাবেই বায়ুমন্ডলে বিদ্যুৎ সৃষ্টি হয়ে মেঘে জমা থাকে। এই বিদ্যুৎ মেঘে দুটি চার্জ ধনাত্মক ও ঋণাত্মক হিসেবে থাকে। বিপরীত বিদ্যুৎশক্তির দুটো মেঘ কাছাকাছি এলেই পারস্পরিক আকর্ষণে চার্জ বিনিময় হয়। ফলে বিদ্যুৎ চমকায়। মেঘের নিচের অংশ ঋণাত্মক চার্জ বহন করে। আবার ভূপৃষ্ঠে থাকে ধনাত্মক চার্জ। দুই চার্জ মিলিত হয়ে তৈরি করে একটি ঊর্ধ্বমুখী বিদ্যুৎপ্রবাহ রেখা, যা প্রচন্ড বেগে উপরের দিকে উঠে যায়। ঊর্ধ্বমুখী এই বিদ্যুৎপ্রবাহ উজ্জ্বল আলোর যে বিদ্যুৎপ্রবাহের সৃষ্টি করে তা-ই বজ্রপাত। বজ্রপাতের তাপ ৩০ থেকে ৬০ হাজার ডিগ্রি ফারেনহাইট পর্যন্ত হয়। বিদ্যুৎ চমকানোর ব্যাপারটি অনেকটা 'শর্ট সার্কিটের' মতো ব্যাপার। আর একেকটি বিদ্যুৎ চমক ৫০০ মিলিয়ন ভোল্ট পর্যন্ত শক্তিশালী হতে পারে। তবে অধিকাংশই মাটি স্পর্শ করে না বরং মেঘ থেকে মেঘে স্থানান্তর হয়।

মৌসুমী বায়ু বাংলাদেশে প্রবেশের আগে কালবৈশাখী ঝড় শুরু হয়। সাধারণত মার্চ থেকে শুরু করে মে পর্যন্ত চলে এ ঝড়। আগেরদিনে গ্রামের মানুষ বলত বৈশাখ মাসের ১২ তারিখ থেকে জ্যৈষ্ঠ মাসের ১৩ তারিখের মধ্যে বেশি কালবৈশাখী ঝড় হয়ে থাকে। কালবৈশাখী ঝড়ের সময় বেশি বজ্রপাত ঘটে এবং মানুষ বেশি মারা যায়। আবহাওয়া বিজ্ঞানে বলা হয়, গ্রীষ্মকালে দিনের তাপমাত্রা বৃদ্ধির সাথে বাতাস গরম হয়ে উপরে উঠতে থাকে। জলীয়বাষ্পও উপরে উঠে আর মেঘের ভিতর যত বেশি পরিমাণে জলীয়বাষ্প ঢুকবে তত বেশি উলম্ব মেঘের সৃষ্টি হবে। এ সময় 'আপ ড্রাফ' এবং 'ডাউন ড্রাফ' বাতাসে চলতে থাকে। একে বলা হয় বজ্রমেঘ। মেঘের উপরের অংশে পজেটিভ এবং নিচের ও মধ্য অংশে নেগেটিভ বিদ্যুত্ তৈরি হয়। পজেটিভ ও নেগেটিভ মেঘের ভিতরের বিদ্যুৎ আধারে দূরত্ব বেড়ে গেলে প্রকৃতির নিয়মে ভারসাম্য আনার প্রক্রিয়া শুরু হয়। পজেটিভ ও নেগেটিভ মেঘ থেকে বিদ্যুত্ আদান-প্রদান শুরু হয়। পজেটিভ ও নেগেটিভ বিদ্যুত্ সঞ্চালন শুরু হলে বজ্রের সৃষ্টি হয়। আর তখনই বজ্রপাত হতে থাকে। পজেটিভ ও নেগেটিভ মেঘ একত্র হলে বিদ্যুৎ সঞ্চালনের ফলে বাতাসের তাপমাত্রা ২০ হাজার ডিগ্রি থেকে ৩০ হাজার ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত হয়ে থাকে। মেঘের ভিতর থাকা নাইট্রোজেন ও অক্সিজেন গ্যাসের সমপ্রসারণ ঘটে। গ্যাসের কম্পনের ফলে মেঘের গর্জন সৃষ্টি হয়। বজ্র সৃষ্টি হয়ে তা পৃথিবীর বুকে আছড়ে পড়ার প্রক্রিয়াটিও বেশ জটিল।

বজ্রপাতের স্থায়িত্বকাল এক সেকেন্ডের দশ ভাগের এক ভাগ। ঠিক এই সময়েই বজ্রপাতের প্রভাবে বাতাস সূর্যপৃষ্ঠের পাঁচ গুণ বেশি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। প্রচন্ড শব্দে কেঁপে ওঠে চারপাশ। শব্দের গতি আলোর গতির থেকে কম হওয়ায় বজ্রপাতের পরই শব্দ শোনা যায়। বজ্রপাত ভূমিকম্পের চেয়েও অনেক বেশি শক্তিশালী। একটি বজ্রপাতে প্রায় ৫০ হাজার অ্যাম্পিয়ার বিদ্যুৎশক্তি থাকে। অথচ বাসাবাড়ির বিদ্যুৎ চলে গড়ে ১৫ অ্যাম্পিয়ারে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিভাগের এক প্রতিবেদনে জানা যায়, একেকটি বজ্রপাতের সময় প্রায় ৬০০ মেগাভোল্ট বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয়। বাসাবাড়িতে আমরা যে বিদ্যুৎ ব্যবহার করছি তার মাত্রা মাত্র ২২০ ভোল্ট। একটি বজ্র কখনও কখনও ৩০ মিলিয়ন ভোল্ট বিদ্যুৎ নিয়েও আকাশে জ্বলে ওঠে। বিজ্ঞানীদের মতে, আকাশে যে মেঘ তৈরি হয়, তার ২৫ থেকে ৭৫ হাজার ফুটের মধ্যে বজ্রপাতের ঘটনা ঘটে বেশি। বজ্রপাতের গতি প্রতি সেকেন্ডে ৬০ হাজার মিটার বেগে নিচে নেমে যায়। এই বিপুল পরিমাণ তাপসহ বজ্র মানুষের দেহের ওপর পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই তার মৃত্যু হয়। একজন মানুষের মৃত্যুর জন্য মাত্র ১১০ ভোল্ট বিদ্যুৎ যথেষ্ট।

ব্র্যাক-এর দুযোর্গ ব্যবস্থাপনা বিশেষজ্ঞ নাঈম ওয়ারা এ বিষয়ে বলেন, "বজ্রপাত প্রকৃতির একটি স্বাভাবিক ঘটনা। এটা আগেও ছিল, এখনো আছে। তবে বজ্রপাতে মানুষের মৃত্যুর হার বেড়ে গেছে। এর প্রধান কারন উঁচু বা লম্বা গাছপালা কেটে ফেলা। উঁচু গাছ না থাকায় খোলা আকাশের নীচে কৃষক যখন কাজ করেন, তখনই তিনি বজ্রপাতের শিকার হন। উঁচু গাছ থাকলে ঐ গাছেই বজ্রপাত হতো, গাছ টেনে নিত। কিন্তু সেটা না থাকায় খোলা মাঠ, হাওর বা নদীতে বজ্রপাতের কারণে মানুষ মারা যাচ্ছে।'' তিনি জানান, "বজ্রপাত শহরেও হয়। কিন্তু সেখানে উচু ভবন বা স্থাপনা আছে, বিদ্যুতের উঁচু খুটি আছে। তাই শহরে বজ্রপাতে মৃত্যুর ঘটনা তেমন ঘটে না।'' তাঁর কথায়, "বজ্রপাতে সাধারণত গরিব মানুষ মারা যায়, কৃষক মারা যায়। তাই তাঁদের নিয়ে আমরা তেমন ভাবি না। বজ্রপাতে যাঁরা আহত হন, তাঁদের চিকিৎসার কোনো আলাদা ব্যবস্থা নেই আমাদের দেশে।'' এই দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিশেষজ্ঞ বলেন, "বজ্রপাত আমাদের কৃষি এবং পরিবেশের জন্য অপরিহার্য। বজ্রপাত না হলে কৈ মাছ ডিম দেবে না। মাছের প্রজনন হবে না। এটা প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়ম। তাই বজ্রপাত কমানোর কোনো উপায় নেই, তার দরকারও নাই। আগে গ্রামে, মাঠের মধ্যে উঁচু উঁচু গাছ ছিল, যা বজ্রপাতের আঘাত থেকে মানুষ, প্রাণীদের রক্ষা করতো। আমরা তা কেটে ফেলেছি। তাই প্রকৃতি এখন আমাদের শাস্তি দিচ্ছে। আমাদের তাই এখন ভাবতে হবে, আমরা কীভাবে বজ্রপাত থেকে বাঁচবো।''

৪. বাংলাদেশে বজ্রপাতে মৃত্যু বাড়ছে কেন?

বজ্রপাতকে জাতীয় দুর্যোগ হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছিল ২০১৫ সালে। ওই বছর বজ্রপাতে নিহত হয়েছিলেন ১৮৬ জন। অবস্থার এখনো উন্নতি হয়নি। দুর্যোগ ফোরামের প্রতিবেদন অনুযায়ী, বাংলাদেশে ২০১৭ সালে ২০৫, ২০১৬ সালে ২৪৫, ২০১৫ সালে ১৮৬, ২০১৪ সালে ২১০, ২০১৩ সালে ২৮৫, ২০১২ সালে ৩০১ এবং ২০১১ সালে ১৭৯ জন বজ্রপাতে নিহত হয়েছেন।

যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল লাইটনিং সেফটি ইনস্টিটিউটের ২০১০ সালে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে বিশ্বে বজ্রপাতে মৃত্যুর এক-চতুর্থাংশ ঘটে বাংলাদেশে। বাংলাদেশের জনসংখ্যার ঘনত্ব বেশি হওয়ায় মূলত মৃত্যুর সংখ্যা বাড়ছে। বজ্রপাতের আক্রান্তেরর শিকার ৭৬ ভাগ পুরুষ। এ সংস্থার মতে, বজ্রপাতের সময় গাছের নিচে আশ্রয় গ্রহণকারীরাই বেশি আক্রান্ত হচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রের রিস্ক ফ্যাক্টরস এ্যান্ড সোস্যাল ভারনারেবেলিটি শীর্ষক গবেষণায় বলা হয়েছে বজ্রপাতে বাংলাদেশে প্রতিবছর দেড়শ'র মতো লোকের মৃত্যুর খবর পত্রিকায় প্রকাশিত হলেও এ সংখ্যা ৫শ' থেকে এক হাজার। এ সংস্থার মতে, ঝড় ও বজ্রঝড়ে বিশ্বে সবচেয়ে বেশি মানুষের মৃত্যু ঘটছে বাংলাদেশে। জাতীয় সংসদে প্রশ্নোত্তরে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রীর দেওয়া তথ্যমতে, বজ্রপাতে দেশে প্রতিবছর ৩০০ থেকে ৩৫০ মানুষের মৃত্যু হয়। বজ্রপাতের ভয়াবহতা ও প্রতিকারের উপায় নিয়ে সার্কভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে গবেষণার জন্য ঢাকায় প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে সার্ক মিটিওরোলজিক্যাল রিসার্চ সেন্টার। এ সংস্থার তথ্য অনুযায়ী বজ্রপাতের হার ও মৃত্যুর সংখ্যা দুটোই উদ্বেগজনকভাবে বাড়ছে। এ সংস্থার মতে, বাংলাদেশ বজ্রপাত ঝুঁকিপূর্ণ দেশ।

বজ্রপাত বেড়ে যাবার কারণ কী সেটি নিয়ে বাংলাদেশে বিস্তারিত কোন গবেষণা নেই। তবে আন্তর্জাতিকভাবে বিভিন্ন গবেষক এর নানা কারণ তুলে ধরেন। কোন কোন গবেষক বলেন তাপমাত্রা এক ডিগ্রি বাড়লে বজ্রপাতের সম্ভাবনা ১০ শতাংশ বেড়ে যায়। পৃথিবীর যে কয়েকটি অঞ্চল বজ্রপাত প্রবণ তার মধ্যে দক্ষিণ-এশিয়া অন্যতম। তাদের মতে সাম্প্রতিককালে বজ্রপাতে মৃতের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ার অন্যতম কারণ হলো বায়ু দূষণ। এছাড়া জলবায়ু পরিবর্তনের কারণেও এটি ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। পরিসংখ্যান মতে গত ১০ বছরের বাংলাদেশে মারা গেছে সাড়ে চার হাজারের বেশি মানুষ। বছরে গড়ে ৮০ থেকে ১২০ দিন বজ্রপাতের ঘটনা ঘটছে। এপ্রিল-মে মাসে বজ্রপাত বেশি হচ্ছে। এ সময়ে প্রতি বর্গকিলোমিটারের ৪০টির বেশি বজ্রপাত হচ্ছে। তাদের মতে, বর্তমানে বজ্রপাত বিধ্বংসী রূপ নিচ্ছে। ফলে মানুষের মৃত্যুর ঘটনা বেশি ঘটেছে। বজ্রপাত দেশে বর্তমানে একটি দুর্যোগে রূপ নিয়েছে। উন্নত দেশগুলোতে বজ্রপাতে মানুষের মৃত্যু কমলেও বাংলাদেশের মতো

উন্নয়নশীল দেশগুলোতে এ সংখ্যা বাড়ছে। বাংলাদেশে বজ্রপাতে যারা মারা যাচ্ছেন তাদের বেশিরভাগই মাঠে কাজ করেন।

বাংলাদেশে প্রতিবছর কতগুলো বজ্রপাত হয় সেটি রেকর্ড করার প্রযুক্তি নেই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রতিবছর ২৫ মিলিয়ন বজ্রপাত হয়। কিন্তু বজ্রপাতে মানুষ মারা যায় ৪০ থেকে ৫০ জন। ভারতীয় আবহাওয়া অফিসের রাডার থেকে প্রাপ্ত তথ্য এবং জাপানের মহাকাশ গবেষণা সংস্থার তথ্য মতে দেখা যাচ্ছে বাংলাদেশে প্রতিবছর গড়ে ২৪০০'র মতো বজ্রপাতের ঘটনা ঘটে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্সটিউট অব ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড ভালনারেবিলিটি স্ট্যাডিজ বিভাগের অধ্যাপক ড. খন্দকার মোকাদ্দেম হোসেন বলেন, "বজ্রপাত একটি স্বাভাবিক ঘটনা আগেও হয়েছে। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে এটা বেড়ে গেছে। গত দুই-তিন বছরে গড়ে ৩০০-৪০০ লোক মারা গেছে। অতীতে এমন হয়নি।" এর কারণ জানতে চাইলে তিনি বলেন, "প্রধানত দু'টি কারণে এই পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। বৈশ্বিক উষ্ণতার কারণে আবহাওয়া ও জলবায়ুর ব্যাপক পরিবর্তন হয়েছে। এর ফলে বৃষ্টিপাতের ধরন ও সময় পরিবর্তন হয়েছে। কালবৈশাখি বেশি হচ্ছে। আর বজ্রপাতের সংখ্যা বা পরিমাণ বেড়ে গেছে। অন্যদিকে আগে গ্রামাঞ্চলে প্রচুর উঁচু গাছ ছিল। তাল গাছ, বটগাছ প্রভৃতি। স্বাভাবিক নিয়মে বজ্রপাত হলে এসব উঁচু গাছ তা অ্যাসজর্ব করে নিতো। কিন্তু এখন তা না থাকায় যখন খোলা মাঠে বজ্রপাত হয় তা মানুষের মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়ায়। শহরে গাছ না থাকলেও উঁচু উঁচু ভবন আছে। ফলে শহরের মানুষ এই মত্যু থেকে রেহাই পাচ্ছে।" তিনি আরো বলেন, "আমাদের গাছ লাগাতে হবে। প্রতিরোধক ব্যবস্থাও নিতে হবে। তবে সবার আগে প্রয়োজন মানুষকে সচেতন করা। বৃষ্টি, ঝড় শুরু হলেই, বিশেষ করে যারা গ্রামে খোলা মাঠে থাকেন, তাঁরা যেন ঘরে আশ্রয় নেন।"

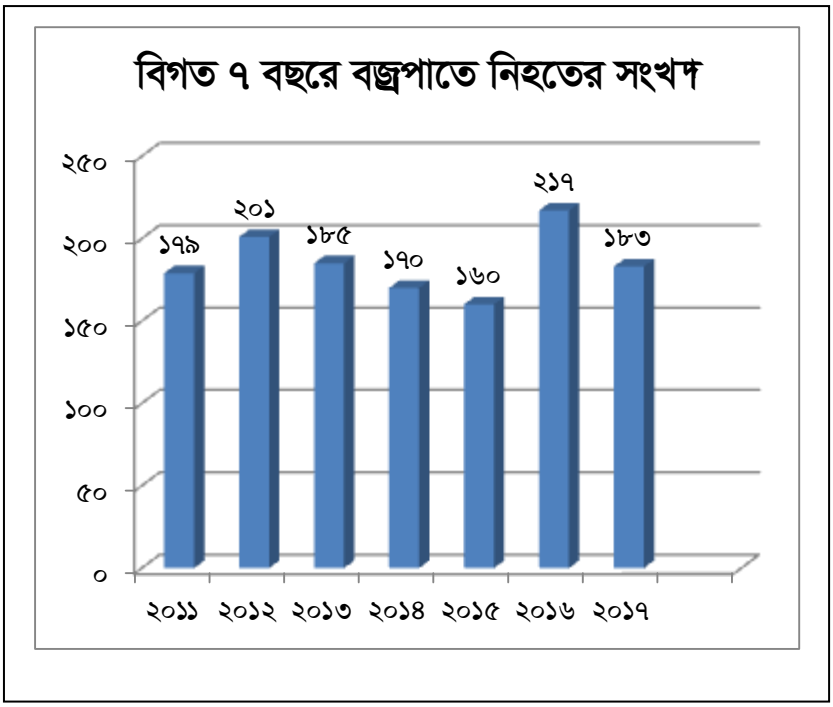
বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা)-র প্রধান ড. আব্দুল মতিন বলেন, "বায়ুদূষণও একটি কারণ, এ কারণেও বজ্রপাত বাড়ছে।" তিনি আরো বলেন, "গাছ কাটার জন্য আমরা সবাই দায়ী। আমাদের সচেতন হতে হবে। এখনো যে গাছ আছে, তা যদি আমরা সংরক্ষণ করতে পারি, তাহলে পাঁচ বছরের মধ্যে পরিস্থিতি পালটে যাবে।"

গবেষকেরা আরো বলেছেন যে, দেশের বেশির ভাগ এলাকায় মুঠোফোন ও বৈদ্যুতিক টাওয়ার রয়েছে। দেশের কৃষিতেও যন্ত্রের ব্যবহার বেড়েছে। তাছাড়া, সন্ধ্যার পরে মানুষের ঘরের বাইরে অবস্থান বাড়ছে। আর বেশির ভাগ বজ্রপাতই হয় সন্ধ্যার দিকে। আকাশে সৃষ্টি হওয়া বজ্র মাটিতে কোনো ধাতব বস্তু পেলে তার দিকে আকর্ষিত হচ্ছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দুর্যোগ বিজ্ঞান ও ব্যবস্থাপনা বিভাগের শিক্ষক ইজাজুল হক বলেন, 'স্থানীয় এবং বৈশ্বিক কিছু কারণ রয়েছে বজ্রপাত হওয়ার পেছনে। স্থানীয় কারণের মধ্যে রয়েছে- মানুষের মধ্যে অসচেতনতা, বড় গাছ-পালা না থাকা এবং সবক্ষেত্রে যন্ত্রের ব্যবহার বেড়ে যাওয়া। আর বৈশ্বিক কারণের মধ্যে অন্যতম কারণ হচ্ছে তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়া।' ইজাজুল হক বলেন, প্রশান্ত মহাসাগরীয় বায়ুপ্রবাহের ভূমিকা আছে এ ক্ষেত্রে। মহাসাগরের পানির তাপমাত্রা বেড়ে বায়ুপ্রবাহে তা যুক্ত হয়ে ঝড়ের প্রকোপ বাড়াতে ভূমিকা রাখতে পারে। হাওর অঞ্চলে আর্দ্রতা বেশি হওয়া সে অঞ্চলে বজ্রপাত বেশি হওয়ার একটি কারণ হতে পারে।

বাংলাদেশের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর বলছে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে দেশে বজ্রপাতে মানুষ মারা যাবার সংখ্যা আগের তুলনায় বেড়েছে। বজ্রপাতে মানুষ মারা যাবার সংখ্যা যেমন বাড়ছে তেমনি বজ্রপাতের প্রবণতাও বেড়েছে। বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের আবহাওয়াবিদ রুবাইয়াত কবির জানিয়েছেন দেশের কিছু অঞ্চল বজ্রপাত-প্রবণ। এর মধ্যে উত্তরাঞ্চল এবং উত্তর পশ্চিমাঞ্চল অন্যতম। গ্রীষ্মকালে এ অঞ্চলে তাপমাত্রা বেশি থাকায় এ পরিস্থিতির তৈরি হয় বলে জানান মিঃ কবির।

তিনি বলেন যেসব এলাকায় গ্রীষ্মকালে তাপমাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি থাকে সেসব এলাকায় যে মেঘের সৃষ্টি হয়, সেখান থেকেই বজ্রপাতের সম্ভাবনা থাকে। বজ্রপাত বেড়ে যাবার কারণ কী সেটি নিয়ে বাংলাদেশে বিস্তারিত কোন গবেষণা নেই। তবে আন্তর্জাতিকভাবে বিভিন্ন গবেষক এর নানা কারণ তুলে ধরেন। কোন কোন গবেষক বলেন তাপমাত্রা এক ডিগ্রি বাড়লে বজ্রপাতের সম্ভাবনা ১০ শতাংশ বেড়ে যায়। পৃথিবীর যে কয়েকটি অঞ্চল বজ্রপাত প্রবণ তার মধ্যে দক্ষিণ-এশিয়া অন্যতম। উন্নত দেশগুলোতে বজ্রপাতে মানুষের মৃত্যু কমলেও বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলোতে এ সংখ্যা বাড়ছে। বাংলাদেশে বজ্রপাতে যারা মারা যাচ্ছেন তাদের বেশিরভাগই মাঠে কাজ করেন। বজ্রপাতে মৃত্যুর বিষয়টিকে এখন অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগের মতোই বিবেচনা করছে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর। বন্যা এবং সাইক্লোনের মতো দুর্যোগের ক্ষেত্রে কিছু প্রস্তুতি নেবার সুযোগ থাকলেও বজ্রপাতের বিষয়টি ভূমিকম্পের মতোই আকস্মিক। কিন্তু তারপরেও মেঘের আনাগোনা দেখে বজ্রপাতের সম্ভাবনা সম্পর্কে খানিকটা ধারনা করা যেতে পারে বলে উল্লেখ করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইলেকট্রনিক এন্ড ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধ্যাপক ড: এ এইচ এম আসাদুল হক।

৫. বাংলাদেশে বজ্রপাতে ক্ষয়ক্ষতির পরিসংখ্যান ১ মে ২০১৮



চলতি ২০১৮ সালে এ পর্যন্ত বজ্রপাতে মৃত্যুর সংখ্যা প্রায় ১৮০ ছাড়িয়েছে বলে জানিয়েছে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ। বাংলাদেশে ২০১০ সাল থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত বজ্রপাতের ঘটনায় ১৮০০'র বেশি মানুষ মারা গেছে। ২০১০ সাল থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত অর্থাৎ আট বছরের বাংলাদেশের প্রথম সারির চারটি দৈনিক সংবাদপত্রে বজ্রপাতে মারা যাবার যেসব খবর প্রকাশিত হয়েছে সেগুলোকে একত্রিত করে দেখা যায় যে আট বছরে বজ্রপাতে নিহতের সংখ্যা ১৮০০'র বেশি। বেশিরভাগ মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে হাওর অঞ্চলের নয়টি জেলায়। এতে দেখা গেছে বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি বজ্রপাত হয় সুনামগঞ্জ এবং মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গলে। হাওর জেলা সুনামগঞ্জের স্বরস্বতিপুর গ্রাম থেকে কৃষক এনামুল হক বলেন, তাদের একটি মসজিদে সন্ধ্যায় নামাজের সময় বজ্রপাতে একসাথে ১৩ জনের মৃত্যু হয়েছিল ২০১১ সালে। সেই থেকে গ্রামটিতে বজ্রপাত নিয়ে আতংক তৈরি হয়েছে। এবং তাদের এলাকায় প্রতিবছর বজ্রপাতে মৃত্যুর সংখ্যা বেড়েই চলেছে বলে তিনি উল্লেখ করেছেন। জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন সিস্টেম ব্যবহার করে দেখা গেছে রংপুর বিভাগের মধ্যে ঠাকুরগাঁও এবং লালমনিরহাটে সবচেয়ে বেশি বজ্রপাত হয়। রাজশাহী বিভাগের সবচেয়ে বেশি বজ্রপাত হয় চাঁপাইনবাবগঞ্জে। ময়মনসিংহ বিভাগে সবচেয়ে বেশি বজ্রপাত হয় নেত্রকোনায়। ঢাকা বিভাগে সবচেয়ে বেশি বজ্রপাত হয় কিশোরগঞ্জে। তবে সুনামগঞ্জে বজ্রপাত বেশি হলেও মানুষ মারা যাচ্ছে বেশি উত্তরাঞ্চলে। একটি বিষয় লক্ষনীয় যে, একটা জায়গায়

বজ্রপাত বেশি হচ্ছে, কিন্তু মারা যাচ্ছে কম। আবার অন্য জায়গায় বজ্রপাত কম হলেও মানুষ মারা যাচ্ছে বেশি। চলতি বছর মার্চ ও এপ্রিল মাসে বজ্রপাতে মারা গেছে ৭০ জন মানুষ। গত মার্চ মাসে ১২ জন এবং এপ্রিল মাসে ৫৮ জনের মৃত্যু হয়েছে বজ্রপাতে।'

ন্যাশনাল জিওগ্রাফির এক গবেষণা বলছে, বজ্রপাতের সময় যারা ঘরের বাইরে অবস্থান করেন তাদের দুর্ঘটনার আশঙ্কা বেশি। এর মধ্যে ৫১ শতাংশই কৃষক দুর্ঘটনার শিকার হন। তারা বজ্রপাতের সময় নিজেদের খেতে কাজ করেন। আর ১১ শতাংশই শিক্ষার্থী খোলা মাঠে খেলার সময় বজ্রপাতে দুর্ঘটনায় পড়েন। তবে বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে যারা এ সময় ঘরের মধ্যে অবস্থান করেন তারাও দুর্ঘটনার শিকার হন। দেশে সবচেয়ে বেশি বজ্রপাতপ্রবণ এলাকাগুলো হচ্ছে চাঁপাইনবাবগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ, ময়মনসিংহ, লালমনিরহাট, সুনামগঞ্জ, সাতক্ষীরা, দিনাজপুর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, শ্রীমঙ্গল, সিলেট, ফরিদপুর ও সৈয়দপুর। আর ঢাকায় গড়ে প্রতি বছর ১২৪টি বজ্রপাতের ঘটনা ঘটে। গবেষণা থেকে জানা যায়, বজ্রপাত সম্পর্কে এসব এলাকার ৫৮ শতাংশ মানুষই অসচেতন। বজ্রপাত শুধু মানুষ ও গবাদি পশুর প্রাণহানি ঘটায় না। এর সঙ্গে ফসল, ঘরবাড়ি ও মৎস্য সম্পদেরও ক্ষতি করে। গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য, বজ্রপাতের জন্য ৭০ শতাংশ মানুষ হালকা, ২০ শতাংশ মধ্যম মানের এবং ১০ শতাংশ মানুষ উচ্চ শ্রবণ সমস্যায় ভুগছেন। এ ছাড়া একই কারণে মানুষ দীর্ঘমেয়াদি রোগ, হৃদরোগ, স্ট্রোক, ত্বক এবং মস্তিষ্কের সমস্যায় আক্রান্ত হন।

৬. বজ্রপাতে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচার কৌশল

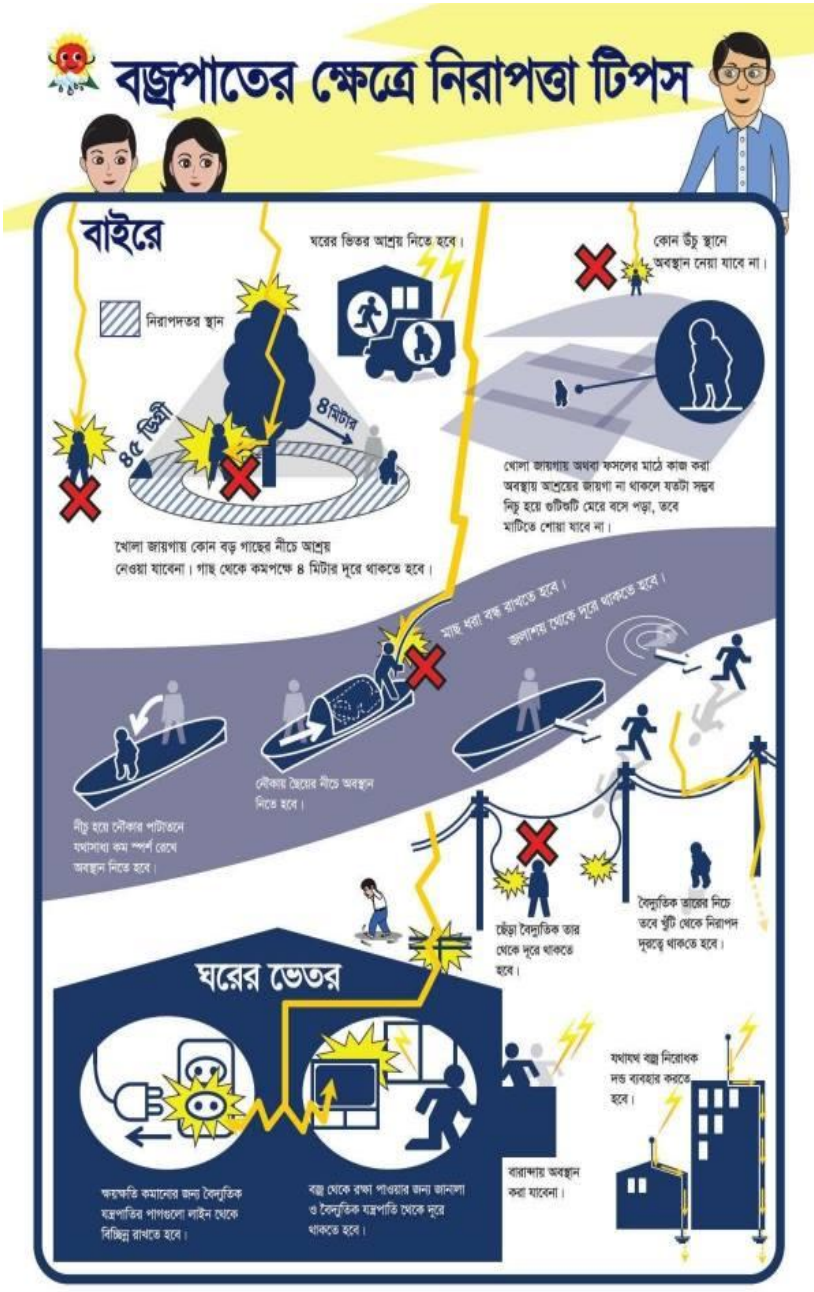
গত ছয় বছরে বজ্রপাতে মৃত্যুর ঘটনার মধ্যে কয়েকটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে। বেশির ভাগ মৃত্যুই হয়েছে উন্মুক্ত জায়গায়। ফসলের খেতে কাজ করতে গিয়ে বা নৌকায় থাকা অনেকে নিহত হয়েছেন। আবার মৃত ব্যক্তিদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় আছে শিশুরা। ঝড়–বৃষ্টি চলাকালে খেলার মাঠে তাদের মৃত্যু হয় বেশির ভাগ ক্ষেত্রে। যুক্তরাষ্ট্রের উদাহরণ দিয়ে এই বিশেষজ্ঞ বলেন, '২০০৪ সালের দিকে দেশটিতে বছরে তিনশ মানুষ বজ্রপাতে মারা যেতো। সেই সংখ্যা এখন দাঁড়িয়েছে পাঁচ জনে। মানুষের মধ্যে সচেতনতা ও পূর্ব প্রস্তুতি নেয়ায় মৃত্যুর হার কমেছে।' তিনি বলেন, 'আমরাও যদি সচেতন ও বজ্রপাতের পূর্বলক্ষণ বুঝে প্রস্তুত থাকতে পারি তাহলে মৃত্যুর হার কমে যাবে।'

বিশিষ্ট আবহাওয়াবিদ ড. সমরেন্দ্র কর্মকার জানান, বজ্রপাতের হাত থেকে বাঁচার কৌশল বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে মৃত্যুর সংখ্যা কমানো সম্ভব। বজ্রপাতে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাও খুবই কঠিন। তবে সতর্ক হলে মৃত্যুর সংখ্যা কমানো যেতে পারে বলে তিনি জানান। মৌসুমী বায়ু বাংলাদেশে প্রবেশের আগ মুহূর্তে ঘন কালো মেঘ দেখলেই সাবধান হতে হবে। গুরগুর মেঘের ডাক শুনলেই নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যেতে হবে। পাকা বাড়িতে আশ্রয় বেশি নিরাপদ। গাড়ির ভিতরও আশ্রয় নেয়া যেতে পারে। গাছের নিচে, টেলিফোনের খুঁটির পাশে বা বৈদ্যুতিক সঞ্চালন লাইনের খাম্বার পাশে দাঁড়ানো মোটেই নিরাপদ নয়। ফাঁকা মাঠের মধ্যে অবস্থান সবচেয়ে বেশি বিপজ্জনক বলে তিনি জানান। পানির সংস্পর্শে মোটেই যাওয়া যাবে না। মার্চ থেকে এপ্রিল মাসে কালবৈশাখী দুপুরের পরে হয়ে থাকে। এরপর মে'র শেষ পর্যন্ত সকালেও হয়ে থাকে। পশ্চিম, দক্ষিণ-পশ্চিম, উত্তর-পশ্চিম এবং উত্তর আকাশে মেঘের গুরগুর গর্জন শুরু হলে নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যেতে হবে। পূর্ব, উত্তর-পূর্ব এবং দক্ষিণ-পূর্ব আকাশে বিদ্যুত্ চমকালে বজ্রপাতে মৃত্যুর আশংকা কম থাকে। আর বৃষ্টি ও মেঘের গর্জন না থামা পর্যন্ত নিরাপদে থাকা বাঞ্ছনীয় বলে জানান ড. কর্মকার। বজ্রপাতের আওয়াজ শোনার আগেই তা মাটি স্পর্শ করে। সোজাসুজি মানুষের গায়ে পড়লে মৃত্যু অবধারিত। বজ্রপাতে আহত ব্যক্তিকে স্পর্শ করাও বিপজ্জনক। শুকনা কাঠ দিয়ে ধাক্কা দিতে হবে। তিনি জানান, বজ্রপাতের সম্ভাবনা আবহাওয়া বিভাগের রাডারে ধরা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে 'নাউকাস্টনিং' পদ্ধতিতে মিডিয়াতে প্রচার করতে হবে, যাতে মানুষ নিরাপদ স্থানে যেতে পারে। এতে বজ্রপাতে মানুষের মৃত্যুহার কমানো সম্ভব। ঝড়ের পূর্বাভাস দেখলে কখনো খোলা মাঠ, পাহাড়ের চূড়া, সমুদ্রসৈকতে অবস্থান করবেন না। গাছের নিচে, বিদ্যুতের খুঁটি বা তারের নিচে, পুরনো-জীর্ণ বাড়ির নিচে অবস্থান করবেন না। চলন্ত অবস্থায় রাস্তার পাশে গাড়ি থামিয়ে গাড়িতে অবস্থান করুন। কোনো কর্ডযুক্ত ফোন

ব্যবহার করবেন না। মাটির সঙ্গে সংযুক্ত ধাতব পদার্থে হাত বা হেলান দিয়ে দাঁড়াবেন না। বৈদ্যুতিক সংযোগযুক্ত পানির ফোয়ারায় গোসল করবেন না। মরা কিংবা পচন ধরা গাছ ও খুঁটি কেটে ফেলুন। বাসা, অফিস কিংবা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান থেকে বের হলে বিদ্যুতের সব সুইচ বন্ধ রাখুন, দরজা-জানালা ভালোমতো বন্ধ রাখুন। এ সময় সর্তক করার আরেকটি কারণ হচ্ছে, এপ্রিল, মে, জুন এ তিন মাস আমাদের দেশে হঠাৎ ঝড়-বৃষ্টির আশঙ্কা বেশি থাকে।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক রিয়াজ আহমেদ বলেন বজ্রপাতে মৃত্যুর সংখ্যা কমিয়ে আনতে সচেতনতা দরকার। তিনি বলেন, "আশেপাশে যদি কোন উঁচু গাছ থাকে সেখান থেকে দূরে থাকা। টিনের ছাদ এড়িয়ে চলা। উপরে ছাদ আছে এমন জায়গায় চলে আসা।" তিনি বলেন বজ্রপাতের সময় বিদ্যুতের খুঁটি ও টাওয়ার থেকে দূরে থাকতে হবে। তাছাড়া জলাশয় ও পুকুর থেকে দূরে থাকলে ভালো হয় বলে মিঃ আহমেদ উল্লেখ করেন।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন বজ্রপাত প্রতিহত করার কোন সুযোগ নেই, একমাত্র সচেতনতাই পারে বজ্রপাতের হাত থেকে রক্ষা করতে। গবেষকরা বলছেন, নির্দিষ্ট কিছু পদক্ষেপ নিলে বা সচেতন হলে বজ্রপাতে মৃত্যু কমানো যায়। যুক্তরাষ্ট্রে এ ধরনের উদ্যোগ কার্যকর হয়েছে এবং এই ধরনের মৃত্যু কমে এসেছে বহুলাংশে। বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ,



ক. এপ্রিল থেকে জুন পর্যন্ত বজ্রপাত বেশি। তাই এ সময় আকাশে কালো মেঘ দেখা দিলে ঘরের বাইরে না যাওয়াই ভালো। আর বাইরে থাকলে দ্রুত দালান বা কংক্রিটের স্থাপনার নীচে অবস্থান নিতে হবে।

খ. খোলা জায়গা, মাঠ বা উঁচু জায়গায় বজ্রপাতে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা বেশি। বজ্রপাতের সময় এমন জায়গায় থাকলে দাঁড়িয়ে থাকা যাবে না। চোখ বন্ধ করে কানে হাত দিয়ে বসে পড়তে হবে। কোনোভাবেই শোয়া যাবে না এতে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি বাড়ে।

গ. বড় গাছের নিচে দাঁড়ানো নিরাপদ নয় থাকতে হবে অন্তত আট কদম দূরে। কাছে থাকা যাবে না বিদ্যুতের খুঁটি ও মোবাইল টাওয়ারের।

ঘ. বজ্রপাতের সময় গাড়ির ভেতর থাকলে ধাতব অংশ স্পর্শ করা যাবে না। বাড়ির ভেতর ধাতব কল, সিঁড়ির রেলিং, পাইপে হাত দেয়া বিপদের কারণ হতে পারে। জানালা ও বারান্দা থেকেও দূরে থাকতে হবে।

ঙ. ঝড়-বৃষ্টির সময় শিশুদের খোলা মাঠে খেলাধুলা করতে দেয়া যাবে না। নদী, পুকুর, জলাশয় থেকে দূরে থাকতে হবে।

চ. বজ্রপাতের সময় মাছ ধরা বন্ধ রাখতে হবে। নৌকায় থাকলে ছইয়ের নীচে আশ্রয় নিতে হবে। ছই না থাকলে পাটাতনে পায়ের ওপর ভর দিয়ে বসে থাকলে বজ্রপাতের ঝুঁকি কমবে।

ছ. সতর্ক থাকলে বজ্রপাতে মৃত্যু এড়ানো সম্ভবঃ

সতর্ক থাকলে বজ্রপাতে মৃত্যুর ঘটনা এড়ানো যায়। বৃষ্টিসহ বজ্রপাতের সময় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। কারণ বৃষ্টির মাধ্যমেই বজ্র নিচে নেমে আসে। অনেকে বজ্রপাতের সময় গাছের নিচে আশ্রয় নেন। সেটা আরও বিপজ্জনক। বৃষ্টিতে বিদ্যুৎ পরিবাহী হয়ে গাছও বিপজ্জনক হয়ে ওঠে। ঘনবসতির কারণে বাংলাদেশে বজ্রপাতে প্রাণহানির সংখ্যা বেশি। তবে কিছু সচেতনতা অবলম্বন করলে এ মৃত্যুর হার অনেক কমিয়ে আনা যায়। বজ্রপাতে এত বেশি ভোল্টেজ থাকে যে, আঘাতপ্রাপ্ত ব্যক্তি মুহূর্তেই মারা যান। বজ্রের উচ্চ ভোল্টেজের কারণে দাহ্য পদার্থের ওপর পড়লে তাতে আগুন ধরে যেতে পারে। টিনের চালে পড়লে সেটা তাৎক্ষণিক মাটিতে পরিবাহিত হয়। এ জন্য বজ্রপাতের সময় নিরাপদ আশ্রয়ে থাকতে হবে। তবে এ সময় যদি বৃষ্টি না থাকে তাহলে ভয়ের কিছু নেই। বৃষ্টির মাধ্যমেই এটা নিচে নেমে আসে। তিনি বলেন, বজ্রপাতের সময় মোবাইল ফোনের কারণে একাধিক ব্যক্তির শরীরের মধ্য দিয়ে কারেন্ট পাস হয় মৃত্যু ঘটতে পারে। এ জন্য জনবহুল স্থানে বজ্র পড়লে একসঙ্গে অনেক মানুষের মৃত্যু হতে পারে। আকাশে মেঘে মেঘে ঘর্ষণের সময় বিদ্যুৎ উৎপন্ন হলেও বৃষ্টি না হলে বজ্র নিচে নামার কোনো সুযোগ নেই। বৃষ্টির মাধ্যমেই বজ্র নিচে নেমে আসে। এ জন্য বৃষ্টিসহ বজ্রপাতের সময় বাইরে থাকলে নিরাপদ আশ্রয়ে যেতে হবে। কখনো কখনো আকাশে বজ্রের শব্দ হয়, বিদ্যুৎ চমকায়। কিন্তু সে সময় বৃষ্টি না থাকলে ভয়ের কিছু নেই। কেবল বৃষ্টি হলেই নিরাপদ স্থানে, ঘরের ভেতর চলে যেতে হবে। তিনি বলেন, অনেকে গাছের নিচে আশ্রয় নেন। সেটা অত্যন্ত বিপজ্জনক। কারণ বৃষ্টিতে গাছও বিদ্যুৎ পরিবাহী হয়ে বিপদের কারণ হয়ে ওঠে।

৭. বজ্রপাত প্রতিরোধ ও বাংলাদেশের প্রস্তুতি

বাংলাদেশে বজ্রপাতে সাম্প্রতিককালে মৃত্যুর ঘটনা বেড়ে যাওয়ায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী ইয়াফেস ওসমান। রাজধানীর এক সেমিনারে তিনি বলেন, 'রাজনীতিবিদরা মানুষকে মানুষ নয়, ভোটার মনে করি। রাজনীতিবিদরা যদি মনে করেন, আমার ভোটার মারা যাচ্ছে তখন হয়তো বজ্রপাতে মানুষের মৃত্যুর ব্যাপারে কার্যকর উদ্যোগ নেওয়া হবে।'

তবে ত্রাণ ও পুনর্বাসন অধিদফতরের মহাপরিচালক মোহাম্মদ জহিরুল হক বলেন, প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মেই বজ্রপাত হয়। এটা নিয়ে ঘাবড়ে যাওয়ার মতো কিছু নেই। তিনি জানান, বজ্রপাত নিয়ে অধিদফতরে কোনো গবেষণা বা প্রকল্প নেই।

আবহাওয়া অধিদফতরের ঝড় পূর্বাভাস কেন্দ্রের সহকারী পরিচালক ফারাহ দীবা বলেন, বাংলাদেশে যে দুটি মৌসুমে বজ্রপাত বেশি হয়, এর একটি হলো প্রাইমারি সামার (এপ্রিল থেকে মে)। এ সময় ভার্টিক্যাল ক্লাউড বা স্তম্ভ মেঘ থাকে বলে বজ্রপাত আর কালবৈশাখী হয়। বজ্রপাতে প্রতি বছর গড়ে দুই-তিনশ' মানুষের প্রাণহানি হচ্ছে উল্লেখ করে তিনি আরও বলেন, বজ্রপাত নিয়ে আমাদের অধিদফতরে কোনো জরিপ বা গবেষণা নেই। আমরা শুধু বজ্রপাতে মৃত্যুর পরিসংখ্যান সংগ্রহ করে থাকি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দুর্যোগ গবেষণা, প্রশিক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা কেন্দ্রের গবেষণা কর্মকর্তা উম্মে হাবিবা জানান, বজ্রপাত নিয়ে তাদেরও কোনো গবেষণা নেই।

শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স বিভাগের অধ্যাপক ড. জহির বিন আলম বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে বজ্রপাতের কারণ ও ফলাফল সংক্রান্ত কোনো গবেষণা হয়নি। তবে সম্প্রতি বজ্রপাতে মৃত্যুর হার বেড়ে যাওয়ার কারণ হিসেবে তিনি বলেন, 'মোবাইল ফোন ব্যবহার মানুষের ওপর বজ্রপাতের আশঙ্কা বাড়ায়। বজ্রপাতের সময় মোবাইল ফোন বা ইলেকট্রনিক্স ব্যবহার খুবই বিপজ্জনক। একজন মানুষের সঙ্গে যখন সচল মোবাইল বা ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি থাকে, তখন তা একটি সার্কিট হয়ে যায়। ওই সার্কিটের মধ্য দিয়ে বজ্রপাতের বিদ্যুৎ প্রবাহ ভেতরে প্রবেশ করে।' বজ্রপাত বিষয়ে কোনো গবেষণা নেই বলে জানিয়েছে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ বিজ্ঞান বিভাগ এবং ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগ।

বাংলাদেশ পরিবেশ অধিদফতর সূত্রে জানা গেছে, রাজধানীর বাতাসে কার্বনের পরিমাণ চার শতাংশের বেশি বেড়েছে গত কয়েক বছরে। বাতাসে ধূলিকণার মাত্রা প্রতি ঘনমিটারে ২০০ মাইক্রোগ্রামকে সহনীয় পর্যায়ে ধরা হলেও সেখানে রাজধানীর এলাকাভেদে বাতাসে এ ধরনের উপাদান প্রতি ঘনমিটারে ৬৬৫ থেকে দুই হাজার ৪৫৬ মাইক্রোগ্রাম বা তারও বেশি পরিমাণ পাওয়া গেছে। বজ্রপাতের পরপরই ট্রপোস্টিফয়ার বা বায়ুমন্ডলের সবচেয়ে নিচের স্তরে নাইট্রোজেন অক্সাইডের পরিমাণ বাড়ে। কার্বন ডাইঅক্সাইড বা কার্বন মনো-অক্সাইডের চেয়ে বেশি বিষাক্ত নাইট্রোজেন অক্সাইড রূপান্তরিত হয়ে তা রীতিমতো পরিণত হয় ওজোন গ্যাসে। এ গ্যাস বাতাসের এমন একটি স্থানে ভেসে বেড়ায়, যার ফলে দিন দিন বেড়েই চলেছে বায়ুদূষণের মাত্রা।

বজ্রপাতকে জাতীয় দুর্যোগ বলে ঘোষণা করা হয়েছে বাংলাদেশে। তাই মানুষকে এর হাত থেকে বাঁচাতে একটি সচেতনতামূলক কর্মসূচি নিয়েছে সরকার। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণমন্ত্রী মোফাজ্জেল হোসেন চৌধুরী মায়া বলেন, "বিশ্বব্যাপী জলবায়ুর পরিবর্তন ও বৈশ্বিক উষ্ণায়নের কারণে বাংলাদেশে বজ্রপাতে হতাহতের ঘটনা আশঙ্কাজনক হারে বেড়ে চলেছে। তাই জাতিসংঘের পরবর্তী জলবায়ুবিষয়ক সম্মেলনে বিষয়টি উত্থাপনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।'' দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের পরিচালক (প্রশাসন) আবু তালেব জানান,'বজ্রপাতে মারা গেলে আগে ক্ষতিপূরণ দেয়ার রেওয়াজ ছিল না। কিন্তু এখন কেউ মারা গেলে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে ২০ হাজার করে টাকা দেয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে।'

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব মো.শাহ কামাল বলেন, "উন্নত বিশ্বের দেশগুলো থেকে অতিমাত্রায় কার্বন নিঃসরণ হচ্ছে। এতে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলো জলবায়ু ঝুঁকিতে পড়ছে। এরমধ্যে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে বাংলাদেশ। মরক্কোতে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের জলবায়ু বিষয়ক সংস্থার আগামী সম্মেলনে বাংলাদেশে বজ্রপাতের এই বিষয়টি উত্থাপন করে প্রতিকার চাওয়া হয়।''

মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে এরইমধ্যে বজ্রপাতে নিহত ৮১ জন পরিবারের সদস্যদের মধ্যে ১৫ লাখ টাকা ত্রাণ হিসেবে বিতরণ করা হয়েছে। পরিবার প্রতি সর্বনিম্ন সাত হাজার ৫০০ এবং সর্বোচ্চ ২৫ হাজার টাকা নগদ অর্থ সহায়তাও দেওয়া হয়েছে। এছাড়া বজ্রপাতের তথ্য জানতে ও জানাতে একটি জরুরি দুর্যোগ সেল খোলা হয়েছে। বজ্রপাত কী, বজ্রপাতের সময় কী করতে হবে ও কী করা যাবে না- এ নিয়ে একটি সচেতনতামূলক কর্মসূচি নিয়েছে সরকার।

৮. বজ্রপাত প্রতিরোধে গৃহীত উদ্যোগ

বর্ষা মৌসুম সামনে রেখে বজ্রপাতে প্রাণহানি কমিয়ে আনতে নানা উদ্যোগ নিয়েছে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়। বজ্রপাতে ক্রমবর্ধমান মৃত্যু ঠেকাতে সামাজিক ও প্রযুক্তিগত কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। তবে কর্মসূচির মধ্যে অগ্রাধিকার পাচ্ছে তালগাছ রোপণ। পাশাপাশি রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে বাড়ির ছাদে বজ্র নিরাপত্তা টাওয়ার এবং হাওর এলাকায় একতলা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণের প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। দুর্যোগ

ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় সূত্র জানিয়েছে, ভিয়েতনাম ও থাইল্যান্ডকে অনুসরণ করে বজ্রপাত নিয়ন্ত্রণে নানা প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এরই মধ্যে মন্ত্রণালয়ের একাধিক কর্মকর্তা এ দুটি দেশে প্রশিক্ষণ নিয়েছেন।

প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মকর্তারা রাজধানী ঢাকা ও দেশের কোন কোন জায়গায় এবং বাড়ির ছাদে বজ্র নিরাপত্তা টাওয়ার স্থাপন করা যায় তার একটি ছক তৈরি করছেন। ছক অনুযায়ী টাওয়ার স্থাপন করা হবে। তবে মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা জানান, নিরাপত্তা টাওয়ার নির্মাণের চেয়ে তালগাছ রোপণের ওপরই বেশি জোর দেওয়া হচ্ছে। থাইল্যান্ডে তালগাছ লাগিয়ে বজ্রপাতে প্রাণহানির সংখ্যা কমিয়ে আনা হয়েছে। সেখানকার বিশেষজ্ঞের পরামর্শেই বাংলাদেশ তালগাছ রোপণের ওপর জোর দিচ্ছে। সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, প্রাথমিকভাবে মন্ত্রণালয় থেকে সারাদেশে ১০ লাখ তালগাছ রোপণ করা হচ্ছে। কাজের বিনিময়ে খাদ্য ও কাজের বিনিময়ে টাকা (কাবিটা) কর্মসূচির নীতিমালা পরিবর্তন করে এ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

কর্মকর্তারা বলেন, ভিয়েতনামে টাওয়ার নির্মাণ করে বজ্রপাতে প্রাণহানির হার কমানো হয়েছে। তাই বজ্রপাতপ্রবণ কিছু এলাকায় তালগাছ রোপণ এবং টাওয়ার নির্মাণ দুটির ওপরই সমান গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। বিশেষ করে দেশের হাওর এলাকায় তালগাছের পাশাপাশি টাওয়ার নির্মাণের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণমন্ত্রী মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়া বলেন, বিশ্বব্যাপী জলবায়ুর পরিবর্তন ও বৈশ্বিক উষ্ণায়নের কারণে বাংলাদেশে বজ্রপাতে হতাহতের ঘটনা আশঙ্কাজনক হারে বেড়েছে। আগে বজ্রপাতে বছরে অল্প কিছু লোকের মৃত্যু বা আহত হওয়ার ঘটনা ঘটত। এখন এর সংখ্যা অনেক বেশি। বিষয়টি উৎকণ্ঠার। এরই মধ্যে মন্ত্রণালয় বজ্রপাতে হতাহতের ঘটনাকে জাতীয় দুর্যোগ হিসেবে ঘোষণা করেছে, যাতে দুর্যোগকালে নাগরিকদের সহায়তা করা যায়।

বজ্রপাতে প্রতিবছর বাংলাদেশে কত মানুষের মৃত্যু হয় তার সঠিক পরিসংখ্যান না থাকলেও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর জানিয়েছে, বছরে সাড়ে তিনশ' মানুষের প্রাণহানি ঘটে। বিদেশ থেকে বজ্রপাত নিয়ন্ত্রণের ওপর প্রশিক্ষণ নিয়ে আসা এক কর্মকর্তা বলেন, নিজের মাথায় বজ্রপাতের আঘাত নিয়ে যেসব বড় গাছ বজ্রপাতের থাবা থেকে মানুষকে রক্ষা করে তার অন্যতম তালগাছ। বজ্রপাতে প্রাণহানি ঠেকানোর জন্য এটাই সবচেয়ে কার্যকর স্থানীয় প্রযুক্তি। তবে বর্তমান সময়ে লাগানো তালগাছ বজ্রপাত নিয়ন্ত্রণের উপযোগী হতে কয়েক বছর সময় লেগে যাবে। আবার বজ্রপাতের আঘাত পাওয়া গাছটি নষ্ট হয়ে যাবে। তাই তালগাছ রোপণের পাশাপাশি দ্রুত সময়ের মধ্যে টাওয়ার নির্মাণ জরুরি। তবে হাওর এলাকায় টাওয়ার নির্মাণ স্থায়ী সমাধান হতে পারে বলেও কর্মকর্তারা মত প্রকাশ করেন।

তথ্য সূত্র ঃ

১। ইণ্টারন্যাশনাল ফোরাম অন টর্নেডো ডিজাস্টার রিস্ক রিডাকশন ফর বাংলাদেশ ।

২। রিস্কফ্যাক্টরস অ্যান্ড সোশ্যাল ভালনারেবিলিটি' শীর্ষক গবেষণা প্রতিবেদন- অধ্যাপক ড. টমাস ডাব্লিউ স্মিডলিন ।

৩। যুক্তরাষ্ট্রের কেন্ট স্টেট ইউনিভার্সিটির ডিপার্টমেন্ট অব জিওগ্রাফির তথ্য ও গবেষণা প্রতিবেদন।

৪। সার্ক মিটিওরোলজিক্যাল রিসার্চ সেন্টার (এসএমআরসি) এর বজ্রপাত সংক্রান্ত তথ্য ও গবেষণা প্রতিবেদন।

৫। 'থান্ডারস্টর্ম, লাইটিং অ্যান্ড ক্লাইমেট চেঞ্জ' শীর্ষক গবেষণা প্রতিবেদন-কলিন প্রাইস, গবেষক, তেল আবিব বিশ্ববিদ্যালয় জিওফিজিক্স বিভাগ।

৬। ন্যাশনাল সেন্টার ফর অ্যাটমস্টেফরিক রিসার্চ (এনসিএআর) এর তথ্য ও গবেষনা প্রতিবেদন।

৭। 'গ্লোবাল ওয়ার্মিং লাইকলি টু ইনক্রিস স্টর্মি ওয়েদার, স্পেশালি ইন সার্টেন ইউএস লোকেশন' শীর্ষক গবেষণা প্রতিবেদন- পারডু বিশ্ববিদ্যালয়।

৮। যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল লাইটনিং সেফটি ইনস্টিটিউটের প্রতিবেদন-২০১০।

৯। যুক্তরাষ্ট্রের রিস্ক ফ্যাক্টরস এ্যান্ড সোস্যাল ভারনারেবেলিটি শীর্ষক গবেষণাপত্র।

১০। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয় ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের তথ্য ও গবেষণা প্রতিবেদন।

১১। খান ফাউন্ডেশন প্রকাশিত তথ্য ও গবেষণা প্রতিবেদন।

১২। সমসাময়িক বাংলা ও ইংরেজি সংবাদপত্র।